নারী সাহাবিদের জীবনকথা

মূল
আবদুস সালাম নদভি

অনুবাদ ও সংযোজন
জুবাইর রশীদ

ভাষা-সম্পাদনা
জাকারিয়া মাসুদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচি-কথন

৭ লেখকের কথা
৯ মহিলা সাহাবিদের ইসলাম গ্রহণ
১৮ মহিলা সাহাবিদের ইবাদাত
৩৪ ধর্মীয় জীবন-যাপনের বহিঃপ্রকাশ
৩৭ রাসূলের আনুগত্য ও ভালোবাসা
৪৭ মহিলা সাহাবিদের চারিত্রিক সুষমা
৫৭ মহিলা সাহাবিদের সামাজিক জীবন যাপন
৭২ মহিলা সাহাবিদের যাপিত জীবন
৭৭ মহিলা সাহাবিদের পারস্পরিক লেনদেন
৭৯ মহিলা সাহাবিদের দ্বীনি খেদমত
৮৬ আদর্শ চরিত্র বিনির্মাণ
৮৮ ইলমি খেদমত

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তাআলার। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবতার মুক্তির দূত, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পূত-পবিত্র পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়িনের ওপর; কিয়ামাত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহ্ যাঁদের কাছে ঋণী।

নারীদের মৌলিক তালিম-তারবিয়ত গ্রহণের ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গেলে মুসলিম নারীরা তাদের পূর্বসূরিদের মতো ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক সম্ভ্রম বজায় রাখতে পারবে কি? প্রচলিত নারী-শিক্ষার যারা বিরোধিতা করে তাদের শক্তিশালী দলিল হচ্ছে, আধুনিক ও প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীরা তাদের ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক সম্ভ্রম সোনালি যুগের নারীদের মতো বজায় রাখতে পারছে না। বরং তারা বখে যাচ্ছে, উচ্ছন্নে যাচ্ছে। বিভিন্ন ফিতনায় জড়িয়ে পড়ছে, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য খতরনাক। এ চিত্র তো আজ সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। ফলে আধুনিক নারী-শিক্ষার বিরোধিতা যারা করেন, তারা তাদের দাবির পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ হাজির করতে পেরেছেন।

বিজাতীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও মুসলিম নারীদের জন্য কোনো ধরনের আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারেনি। অবশ্য তা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলামের পূর্ববর্তী ইতিহাস মুসলিম নারীদের জন্য একটি সর্বোত্তম ও মৌলিক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে পেশ করে থাকে। আমরা নারীদের সামনে যদি ইসলামের বৈশিষ্ট্য এবং কিংবদন্তি নারীদের জীবনচরিত তুলে ধরি, তাহলে এর দ্বারা তারা খুব প্রভাবিত হবে। এবং আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার প্রতি বেজার হয়ে নির্ভেজাল মুসলিম চরিত্র, ইসলামি সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার আদলে

নিজেদেরকে গড়ে তুলবে।

ইসলামি ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় নারীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রী এবং শীর্ষস্থানীয় নারী সাহাবিগণ সেই সকল বৈশিষ্ট্যের অন্যপূর্ণা ছিলেন। যুগে যুগে মুসলিম নারীগণ যে-সকল শাখায় কিংবদন্তির খেতাব পেয়েছেন, উম্মুল মুমিনীন ও মহিলা সাহাবিদের মাঝে সেসব একসঙ্গে বিদ্যমান ছিল। বর্তমান নারীদের জন্য তাঁরা ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্বোত্তম আদর্শ। আমাদের মা-জাতি যদি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্যে সিক্ত উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং মহিলা সাহাবিদের আদর্শে আলোকিত হয়, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাহলে অধুনা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে তারা অনেক নিরাপদ থাকবে।

আমি উসওয়ায়ে সাহাবাহ গ্রন্থের উভয়-খণ্ডে সাহাবিগণের যে ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ঘটনাবলি সংকলন করেছি, সেখানে নারী সাহাবিদের সমস্ত বিষয়াদি চলে এসেছে। এরপরও গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আলাদাভাবে ও অধিকতর তথ্যনির্ভর এই সংকলনটি আমি করেছি। ফলে একদিক থেকে এটি নারী সাহাবিদের ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক ও জ্ঞানমুখী জীবনের একটি স্বতন্ত্র সংকলন হিসেবে রূপ নিয়েছে। অপরদিকে এটি হবে আমাদের নারীদের পাঠ ও পথনির্দেশনার জন্য একটি প্রামাণ্য এবং হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী সুবিন্যস্ত গ্রন্থ। এই অনুযায়ী আমল করে তারা বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষার সর্বোত্তম আদর্শ বনে যাবে। সেইসঙ্গে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করা হয়, এর দ্বারা কার্যত তার খণ্ডনও হয়ে যাবে।

আবদুস সালাম নদভি
শিবলি মঞ্জিল, আজমগড়, ভারত
১৩ ডিসেম্বর ১৯২২

মহিলা সাহাবিদের ইসলাম গ্রহণ

হৃদয়ের কোমলতা, চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, নম্রতা, মহানুভবতা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি মুগ্ধ হয়ে প্রভাবিত হওয়া একজন উত্তম মানুষের মৌলিক গুণ। যার হৃদয়টা কোমল, সে ব্যক্তি সহজেই উপদেশ গ্রহণ করে। প্রতিটি উপদেশ দ্রুত রেখাপাত করে তার হৃদয়ে। তালিম, তারবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসিহত, সঠিক দিক-নির্দেশনা গ্রহণে সে আগ্রহী এবং বাস্তবায়নে অধিকতর উৎসাহী হয়। সুন্দর ও কল্যাণকর বিষয় থেকে সে কখনো মুখ ফিরিয়ে নেয় না। তাদের মন-মনন হলো ফুলের পাপড়ির ন্যায়। ভোরের মৃদুমন্দ বাতাসে, স্নিগ্ধ সমীরণে তা হেলতে-দুলতে থাকে। পক্ষান্তরে বৃক্ষের শক্ত কাণ্ডকে প্রচণ্ড ঝড় এসেও নড়াতে পারে না। চোখের নরম-কোমল জ্যোতি কাচের শক্ত আয়নাকে ভেদ করতে পারে। কিন্তু স্পাত লোহার তৈরি তির পাহাড়ের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না। মানুষের হৃদয়ের অবস্থাও ঠিক তেমন। যাদের অন্তর কোমল, তারা উপকারী ওয়াজ-নসিহত, তালিম-তারবিয়ত ও পরামর্শ গ্রহণ করে। আর যাদের অন্তরটা শক্ত ও কঠিন, তারা তা গ্রহণ করতে পারে না। বড় থেকে বড় কোনো ঘটনা তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে না। ফলে তারা বঞ্চিত হয় সত্য ও সুন্দরের কল্যাণ থেকে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণকর পরিণতি থেকে।

ইসলামের সূচনাকালে এমন বহু কাফির ছিল যাদেরকে বহু প্রচেষ্টা করেও আল্লাহ তাআলার সামনে নত করানো যায়নি। বারবার ঈমানের দিকে আহ্বান করার পরও তাদের কোনো সাড়া মিলেনি। তাদের অন্তর এতটাই কঠিন ছিল যে, সেখানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয় বিগলিত বাণীও কোনো প্রভাব ফেলেনি। পক্ষান্তরে সাহাবিগণ কুরআনের একটি আয়াত শুনেই ইসলাম গ্রহণের জন্য পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র মাধুর্য, সুকোমল স্বভাব-প্রকৃতি, তার হৃদয়-গলানো উপদেশ, বাহ্যিক সৌন্দর্য,

আকার-আকৃতি, ইসলামের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা-সহ প্রতিটি প্রভাবক ও মুগ্ধকর বিষয়কে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অন্তর বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছে। ফলে বেশ সহজেই তাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রবেশ করেছেন সত্য ও সুন্দরের শাশ্বত ঠিকানায়।

পুরুষ সাহাবিদের মতো নারী সাহাবিগণও সমানতালে এই ফজিলতে শরিক ছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা ছিলেন অগ্রগামী। যেমন : খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর জন্য তাঁকে কোনো জোর-জবরদস্তি কিংবা হুমকি-ধামকি দিতে হয়নি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত-প্রাপ্তির পর ঘরে এসে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দেন। খুশিমনে, বিনাবাক্যে তিনি কালিমা পড়ে ইসলাম কবুল করে নেন। তারিখু ইবনু খুমাইস গ্রন্থে রাফি রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সোমবার দিন আমি নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছি। খাদিজা সেদিনই বিকেলে আমার সঙ্গে সালাত আদায় করেছে। তার পরদিন মঙ্গলবার সালাত আদায় করেছে আলি। তার পরদিন যাইদ ইবনু হারিসা ও আবূ বকর আমাদের সঙ্গে সালাতে শরিক হয়েছে।”[১]

ইসলামের ঘোষণা প্রদান

শুরুর দিকে ইসলাম কবুলের চেয়ে জনসম্মুখে বিষয়টি প্রকাশ করা ছিল ভীতিজনক। এর জন্য বেশ সাহস ও বীরত্বের প্রয়োজন ছিল। বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল ব্যাপারটা। সে-সময় কাফিরদের জুলুম সকল যুগের বর্বরতাকে হার মানাচ্ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করে মক্কায়। কিন্তু ভয়ানক এই সময়ে পুরুষ সাহাবিদের ন্যায় নারী সাহাবিগণও সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত-প্রাপ্তির পর যে সাতজন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্য জানান দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বকর সিদ্দিক, বিলাল, খাব্বাব, সুহাইব, আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুম—এই ছয়জন ছিলেন পুরুষ। আর সপ্তমজন ছিলেন এক দরিদ্র নারী সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সম্মানিত মা ছিলেন।[২]

[১] তারিখু ইবনু খুমাইস : ২৮৬

[২] তারিখু ইবনু খুমাইস : ২৫৭

মহিলা সাহাবিগণ তাঁদের স্বভাবজত কোমলতার দরুন কেবল সহজভাবে ইসলামই কবুল করেননি, ইসলামের প্রচার-প্রসারেও তাঁরা রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সহীহ বুখারিতে বর্ণিত আছে, একবার সাহাবিগণ এক নারীকে গ্রেফতার করে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসেন। তার নিকট ছিল পানির মশক। এদিকে সাহাবিদের পানির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাসূল যথাযথ বিনিময় দিয়ে তবেই তার কাছ থেকে পানি গ্রহণ করেন। শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেননি। রাসূলের এই সদাচারণে মহিলাটি মুগ্ধ হয়। তার হৃদয়ে রাসূলের নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয়। এরই প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সে ইসলাম কবুল করে।

ইসলামের উষালগ্নের কথা। তখনো উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেননি। এর আগেই তাঁর বোন ও বোনের স্বামীইসলাম গ্রহণ করে নেয়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন এই কথা। জানতে পেরে রাগে-ক্ষোভে তিনি আগুনের মতো জ্বলতে থাকেন। দেরি না করে সাথে সাথে অস্ত্র হাতে ছুটে যান বোনের বাড়ি। দেখামাত্রই মেরে ফেলবেন—এমনটাই উমরের হাভভাব। উমর যাচ্ছেন। লোকেরা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছে। তারা ভাবছে, আর বুঝি রক্ষা নেই। ভাইয়ের হাতে বোনের নির্মম মৃত্যুই লেখা আছে আজ।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাগান্বিত হয়ে বোনকে এই পরিমাণ প্রহার করেন যে, পুরো শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। শরীর ও মুখ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। জোরপূবর্ক ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বোনকে বাধ্য করতে থাকেন উমর। অন্যথায় জানে মেরে ফেলবেন তাকে। কিন্তু তার কোনো হুমকি-ধামকিতে কাজ হয়নি। সীমাহীন নির্যাতন হওয়ার পরও তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, “আমাকে যা খুশি করো। আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি। প্রাণ নিয়ে নিলেও আমি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হব না।”[৩]

এক সফরে সাহাবিগণ প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে ছিল না কোনো পানি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁরা পানির কথা জানালেন। রাসূল তখন দুজন সাহাবিকে পানির খোঁজে লোকালয়ে প্রেরণ করলেন। তাঁরা একজন মহিলাকে উটের ওপর সওয়ার অবস্থায় দেখতে পেলেন। তার সঙ্গে পানি-ভর্তি দুটি মশক ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই দুই মশক পানি একটি পাত্রে ঢাললেন। তারপর সকলকে একে একে পানি পান করতে বললেন। সাহাবিগণ তৃপ্তি সহকারে পানি করলেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এর ফলে পাত্রের পানি সামান্যও কমেনি। এ ঘটনা দেখে উক্ত মহিলা দারুণভাবে প্রভাবিত হলো। ফিরে গিয়ে তার কওমকে বলল, খোদার কসম! আসমানের নিচে

[৩] উসদুল গাবাহ, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনী

জমিনের ওপরে তার মতো বিস্ময়কার মানব আর কেউ নেই। আমার মন বলছে, তিনিই আল্লাহর সত্য নবি।[৪]

মহীয়সী নারী সাহাবি ছিলেন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সম্মানিতা মা। সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। একদিন কাফিররা তাঁকে প্রখর রোদে মরুভূমির গরম বালির ওপর বেঁধে ফেলে রাখে। ওই সময় পাশ দিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছিলেন। সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে রাসূল তাঁকে বললেন, ধৈর্য ধারণ করো। ধৈর্য ধারণ করো। তোমার ঠিকানা জান্নাত। প্রখর রোদে গরম বালুর ওপর ফেলে রেখেও আবূ জাহলের নিষ্ঠুর মনটা শান্ত হয়নি। শেষমেশ ধারালো বর্শা দিয়ে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের সর্বপ্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[৫]

ইসলাম গ্রহণ এবং মদীনায় হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উম্মু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। সইতে হয়েছে পরিবার-পরিজনের বিচ্ছেদ-বেদনা। তিনি নিজেই এর বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমার স্বামী আবূ সালমা আমাকে একটি উটের ওপর বসিয়ে দিলেন। কোলে আমার শিশু সন্তান। আবূ সালমা উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন মদীনার দিকে। চলতে চলতে যখন মক্কার শেষ সীমানায় চলে আসলাম, তখন আমার গোত্র বনু মুগীরার কিছু লোক পথ আগলে দাঁড়াল। তারা আবূ সালমাকে বলল, উম্মু সালমা আমাদের ঘরের মেয়ে। তার ওপর আমাদের কর্তত্ব রয়েছে। তাঁকে নিয়ে দেশে দেশে ঘোরার অধিকার আমরা তোমাকে কিছুতেই দিব না। এই কথা বলে তারা আবূ সালমার কাছ থেকে আমাকে জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে গেল। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখল আবূ সালমার গোত্র বনু আসাদের লোকেরা। তারা দৌড়ে এল ঘটনাস্থলে। তারা বলল, তোমরা তোমাদের মেয়েকে কেড়ে নিয়েছ! জেনে রাখো, সালমা আমাদের গোত্রের সন্তান। তাঁর ব্যাপারে আমাদের অধিকার বেশি। তাঁকে তোমাদের মেয়ের কাছে রাখতে পারবে না। এই কথা বলে আমার শিশু সন্তানকে তারা ছিনিয়ে নিল। এ ঘটনার পর আমি মানসিকভাকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ি। আমার স্বামী আবূ সালামা চলে গেলেন মদীনায়। আমার কোলের সন্তানকে নিয়ে গেল তাঁর গোত্র বনু আবদুল আসাদ। আর আমাকে নিয়ে গেলে আমার গোত্র বনু মুগীরা। আমার ওপর তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল। আমি, স্বামী ও সন্তান তিনদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম আমরা। সে দিনের পর থেকে প্রতি সকালে আমি বালুর সেই উপত্যকায় যেতাম। মক্কার সীমান্তের সন্নিকটের সেই স্থানে যা আমার মর্মান্তিক কাহিনীর সাক্ষী হয়ে আছে সেখানে গিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতাম। সেই বিশেষ সময়ের চিত্রগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কল্পনায়

[৪] সহীহ বুখারি, অধ্যায় : তায়াম্মুম

[৫] উসদুল গাবাহ, সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবনী

স্মৃতিতে দেখতে থাকি যা আমার স্বামী ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেখানে আমি বিলাপ করতে থাকি। যতক্ষণ না উপত্যকায় রাত নেমে আসে। এভাবে কষ্টের নীল স্মৃতি এবং যাতনার অশ্রুতে ভিজে ভিজে আমার জীবনের একটি বছর অতিবাহিত হলো।

একদিন আমার গোত্র বনু মুগীরার এক সজ্জন ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় আমার করুণ অবস্থা দেখে তার হৃদয়ে মায়া জাগল। গোত্রের লোকদের বললেন, তোমরা কি এই বেচারিকে ছেড়ে দিতে পারো না? তোমরা তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে পৃথক করে রেখেছ। এ বলে তিনি বনু মুগীরার লোকদের অন্তরে দয়ামায়া জাগ্রত করার চেষ্টা করলেন। তাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হলো। ক্রোধ ও হিংসা পরিণত হলো কোমল মায়ায়। তারা আমাকে মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যাওয়ার অনুমতি দিল। এ খবর পৌঁছে গেল আবূ সালমার গোত্র বনু আবদুল আসাদের নিকট। তারা আমার সন্তানকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিল। মক্কায় আমি আর এক মুহূর্তও দেরি করলাম না। এমনকি কোনো সফরসঙ্গীর অপেক্ষাও করলাম না। সেদিনের ন্যায় কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং আমার গোত্রের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পূর্বেই আমি মক্কার সীমানা অতিক্রম করতে জোর তৎপর শুরু করে দিই। বাহন হিসেবে দ্রুত একটি উটের ব্যবস্থা করলাম। আমি বাহনে চড়ে বসলাম। সাথে আমার শিশু সন্তান সালামা। মক্কা থেকে একাকী বের হয়ে পড়ি সুদূর মদীনার পথে। সেদিন আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ছিল না আমার সঙ্গে। চলতে চলতে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে তানঈম প্রান্তরে যখন পৌঁছলাম, তখন উসমান ইবনু তালহার সঙ্গে আমার দেখা। তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। পথে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

- কোথায় যাচ্ছ হে আবূ উমাইয়ার কন্যা?

- মদীনায়। স্বামীর কাছে।

- তোমার সঙ্গে কি কেউ নেই?

- না, আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। আর আছে আমার এই ছোট্ট সন্তান।

- আল্লাহর কসম! একাকী তোমাকে এতদূর কিছুতেই যেতে দিব না।

এ বলে উসমান ইবনু তালহা আমার উটের রশি হাতে নিলেন। আমাকে নিয়ে তিনি মদীনার পথ ধরলেন।

আল্লাহর শপথ! আরবে তাঁর চেয়ে সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত দ্বিতীয় কোনো পুরুষ আমি দেখিনি। চলার পথে আমরা কোনো কোনো স্থানে যাত্রা বিরতি দিতাম। তিনি

রশি ধরে উটকে বসাতেন। তারপর আড়ালে কোথাও সরে দাঁড়াতেন। দূরত্ব বজায় রেখে কোনো বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। আবার চলার সময় হলে তিনি উট প্রস্তুত করে আমার কাছে এসে বলতেন, উটে বসো। আমি উটের পিঠে আরাম করে বসার পর তিনি রশি ধরে সামনে চলতে থাকতেন। মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত সারাটা পথ তিনি আমার সাথে এমনই আচরণ করলেন। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে কুবার নিকটবর্তী বনু আমর ইবনু আউফের বসতিতে পৌঁছার পর তিনি বললেন, তোমার স্বামী এ গ্রামেই আছেন। তুমি আল্লাহর নামে চলে যাও। তারপর উসমান ইবনু তালহা আমাকে আমার স্বামীর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।[৬]

ইসলামের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবায়ে কেরামকে এক নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কাফির-মুশরিকদের জুলুম নিপীড়নের পাশাপাশি ছিন্ন করতে হয়েছে রক্তের বন্ধন। প্রয়োজনের খাতিরে, জীবনের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থ-সম্পদ থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। সংকটে, মুসিবতে ধৈর্যধারণ করে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না। আত্মার সাথে শরীরের সম্পর্ক যেমন, প্রিয়জনদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও তেমন। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না কখনো। কিন্তু ঈমান ও ইসলামের জন্য তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে পেরেছেন। ছেড়ে এসেছেন আপন পিতা-মাতা, ভাই -বোন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মমতা ও ভালোবাসার বন্ধন।

পুরুষ সাহাবিগণ এ কাজটি সহজে করতে পারলেও নারী সাহাবিদের জন্য এটা ছিল বেশ কঠিন। তাঁদের অবস্থা ছিল খুবই বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, নারীগণ (বিশেষত সেকালে) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তানের ওপর নির্ভরশীল থাকে। তাদের জীবনের মেরুদণ্ড থাকে মূলত পরিবার-পরিজন। তাদের সহযোগিতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় একজন নারীর জীবন। সাধারণত তারা এ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। কখনো পিতা তার সন্তান থেকে অথবা সন্তান তার পিতা থেকে আলাদা হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন স্ত্রী তার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন তার অবস্থা উত্তাল সমুদ্রে নাবিকহীন জাহাজের মতো হয়ে পড়ে। নানান মুসিবত আর সংকটে ক্রমাগত দুলতে থাকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, নারী সাহাবিগণ ইসলামের জন্য এই কঠিন সিদ্ধান্ত হাসিমুখে বরণ করেছেন। ছিন্ন করেছেন কাফির স্বামীদের দীর্ঘ মায়ার বন্ধন।

[৬] মুসনাদু আহমাদ : ৬/৩০৮; তাবাকাতু ইবনু সা'দ : ৮/৯৩; উসদুল গাবাহ : ৫/৮৮৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২০৬

আকীদা-বিশ্বাস

কাফিররা পুরুষদের মতো নারী সাহাবিদের ওপরও অকথ্য নিপীড়ন চালিয়েছে। তাদেরকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সকল কিছু তারা মুখবুজে সহ্য করে গেছেন। কাফিরদের কঠিনতর নির্যাতনেও তাঁদের জবান থেকে 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক) উচ্চারিত হয়েছে।

উম্মু শারিক রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণের পর তার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে প্রখর সূর্যের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখে। তাঁর ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালায়। একপর্যায়ে রুটির সাথে মিষ্টি-জাতীয় গরম খাবার তাঁকে খেতে বাধ্য করে। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত তিনি। আর কোনো উপায় নেই দেখে সেই রুটি ও গরম খাবার গোগ্রাসে গিলে ফেলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কাফিররা তাঁকে আহারের পর পানি পান করতে দেয়নি। ফলে পিপাসায় তাঁর কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। এভাবে টানা তিনদিন পিপাসার্ত রাখার পর তারা তাঁকে বলল, যে ধর্ম তুমি গ্রহণ করেছ, তা ছেড়ে দাও। উম্মু শারিক রাদিয়াল্লাহু আনহা এতটাই ক্লান্ত ও বেহুঁশ ছিলেন যে, তিনি কাফিরদের কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছিলেন না। তখন কাফিররা আকাশের দিকে আঙুল উঁচু করে ঈমান ও ইসলাম ত্যাগ করার বিষয়টি তাঁকে বুঝিয়ে বলল। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো ওই আকিদার ওপরই অটল আছি।[৭]

শিরকের প্রতি ঘৃণা

নারীরা সাধারণত প্রাচীন ও পূর্ববর্তী রেওয়াজ পালনে বেশ আন্তরিক হয়ে থাকে। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তারা যুগ যুগ চলে আসা রীতিনীতি আঁকড়ে ধরে রাখে। আরবে দীর্ঘকাল শিরক ও মূর্তিপূজার জয়জয়কার ছিল। সকলের মনে-প্রাণে শিরক গেঁথে গিয়েছিল। একে তো পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসা রীতি, দ্বিতীয়ত তারা নিজেরাও সকাল-সন্ধ্যা আয়োজন করে মূর্তিপূজা। ফলে শিরক ছিল তাদের আকিদা-বিশ্বাসের শিকড়। তাই সহসাই যখন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শিরক ও মূর্তিপূজা পরিহার করে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে বললেন, তখন সহজে তারা বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। এ যেন তাদের শিকড়ের মূলে শক্ত কুঠারাঘাত।

কিন্তু এর বিপরীত ছিলেন নারীগণ। তারা ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিরকি আকিদা অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন। মূর্তিপূজাকে অস্বীকার করেছেন। আরবদের দীর্ঘকালের ধারণা ছিল—যে ব্যক্তি দেব-দেবী ও মূর্তিকে গালিগালাজ করবে, বিভিন্ন

[৭] তাবাকাতু ইবনু সা'দ, উম্মু শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবনী

কঠিন রোগ তাকে আক্রান্ত করবে। জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণের পর অন্ধ হয়ে যান। তখন কাফিররা বলতে থাকে, লাত-উজ্জা তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তাদেরকে বলেন, লাত-উজ্জার উপাসকদের কী হলো, কী বলছে তারা? আমার এ বিপদ [অন্ধ হওয়া] তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।[৮]

জাহিলি যুগে ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যেহেতু তার মধ্যে সকল প্রকার শিরকের মিশ্রণ ছিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম এর থেকে বেঁচে থাকতেন। আরবের লোকেরা শিশুদের বিছানার নিচে তরবারি রেখে দিত। তারা বিশ্বাস করত, এর ফলে শিশুরা অকল্যাণ ও সকর প্রকার মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক শিশুর বিছানার নিচে তরবারি দেখে নিষেধ করে বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবিজ-কবজকে ভীষণ অপছন্দ করতেন।[৯]

উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর স্বামী মালিক ইবনু নজরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। স্ত্রীর দুঃসাহস দেখে কাফির স্বামী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। এর কিছুদিন পর মালিক মদীনা ছেড়ে চলে যায় শামে। সেখানেই কাফির অবস্থায় মারা যায়।

মালিক ইবনু নজরের মৃত্যুর পর উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা আবূ তালহা আনসারির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবূ তালহা যখন উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। উম্মু সুলাইম বললেন, এ কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনি একজন মুশরিক আর আমি মুসলিম। তবে আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আমার পক্ষ থেকে কোনো বাধা থাকবে না। ওপরন্তু আপনাকে বিয়ের জন্য কোনো মোহরানাও দিতে হবে না। আপনার ইসলাম গ্রহণই হবে আমাদের বিয়ের মোহর।

এ কথা শুনে আবূ তালহা বললেন, ঠিক আছে, বিষয়টি আমি ভেবে দেখব।

ভেবে-চিন্তে আবূ তালহা সম্মত হলেন। ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। যথারীতি তাঁদের বিয়ে সম্পাদিত হলো।

বিশিষ্ট সাহাবি আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ছেলে। মায়ের বিয়ের ঘটনা বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, আবূ তালহা উম্মু সুলাইমকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, হে আবূ তালহা! আপনি কি জানেন, আপনি যার উপাসনা করেন সে উদ্গত হয়েছে জমিন থেকে? আবূ তালহা বললেন, হ্যাঁ। উম্মু সুলাইম বলেন, আপনার কি লজ্জা হয় না, আপনি বৃক্ষের

[৮] উসদুল গাবাহ, জুনায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবনী

[৯] আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা : ৮০

উপাসনা করেন? আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার বিয়ের কোনো মোহর লাগবে না। আবূ তালহা বললেন, ঠিক আছে। আমি বিষয়টি ভেবে দেখব। এ বলে তিনি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করার পর উম্মু সুলাইম বললেন, হে আনাস! তুমি আবূ তালহার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।[১০]

রাসূলের নুবুওয়াতের ওপর ঈমান

মহিলা সাহাবিদের হৃদয়ের মণিকোঠায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। যেভাবে কিনা পাথরের মাঝে নকশা অঙ্কিত হয়ে শিলালিপি তৈরি হয়। এমনকি তাঁদের শিশু সন্তানদের হৃদয়েও এই বিশ্বাস শক্তভাবে প্রোথিত ছিল। শিশুরা বিশ্বাস করত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে যে কথা বের হয়, কখনো তার বিপরীত হয় না। একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক শিশু কন্যাকে বদ-দুআ দিলেন। বললেন, তোমার বয়স কখনো বাড়বে না। এ কথা শুনে শিশুটি কান্না জুড়ে দিল। কাঁদতে কাঁদতে উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট এসে বলল, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বদ-দুআ দিয়েছেন। এখন আমার বয়স বাড়বে না। তিনি সাথে সাথে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমার কন্যাকে বদ-দুআ দিয়েছেন? তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, আমিও একজন মানুষ। অন্যান্য মানুষের মতো মজাক করি। যাকে আমি এই বদ-দুআ দিয়েছি, সে তো তার উপযুক্ত নয়। সুতরাং এটা তোমার কন্যার জন্য পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধি ও নেকির কারণ হবে।[১১]

[১০] তাবাকাতু ইবনু সা'দ, উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবনী

[১১] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : কিতাবুল বির ও সিলাহ

মহিলা সাহাবিদের ইবাদাত

অধ্যায় : সালাত

জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

নারীদের জন্য জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা ফরয নয়। তা ছাড়া অনেক সাহাবি নারীদের জামাআতে অংশগ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। তবুও মহিলা সাহাবিদের অনেকেই যথাসময়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী নিয়মিত ইশা ও ফজরের সালাত মাসজিদে জামাআতের সঙ্গে আদায় করতেন। একদিন কেউ তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন না, মাসজিদে এসে নারীদের জামাআতের সাথে সালাত আদায় করাটা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপছন্দ করতেন? তারপরও আপনি কেন এমনটি করেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি যদি অপছন্দই করতেন, তবে আমাকে বাধা দিতেন না কেন?[১২]

জুমুআর সালাত

নারীদের ওপর জুমুআর সালাত ফরয নয়। তথাপি এই দিনটিকে তাঁরা অত্যধিক সম্মান করতেন এবং বরকতের উপলক্ষ মনে করতেন। জনৈক মহিলা সাহাবি ছিলেন, যিনি সবজি চাষ করতেন। জুমুআর দিন তিনি সবজি রান্না করে সালাতের পর সাহাবায়ে কেরামকে আহার করাতেন।[১৩]

---

[১২] সহীহ বুখারি, অধ্যায় : সালাত

[১৩] সহীহ বুখারি, অধ্যায় : জুমুআর নামাজ

ইশরাকের সালাত

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশরাকের সালাত যদিও কম পড়েছেন, উম্মু হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনামতে জীবনে মাত্র একবার ইরশাকের সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু নারী সাহাবিদের কেউ কেউ নিয়মিত ইশরাকের সালাত আদায়কে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। নিয়মিত তাঁরা এটি আদায় করতেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইশরাকের সালাত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু আমি নিজে তা পড়ি। কেননা, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু এমন বিষয় পছন্দ করতেন, কিন্তু উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে তার ওপর তিনি আমল করতেন না। আবূ হুরায়রা ও আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশরাকের নামাজ আদায়ের জন্য ওসীয়ত করেছেন। এ জন্য কখনো তাঁরা ইশরাকের নামাজ ছাড়তেন না।[১৪]

তাহাজ্জুদ ও রাতের সালাত

সাহাবিগণ রাতের বেলা তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এ সময় তাঁদের পরিবার-পরিজনকেও ইবাদাতের জন্য জাগিয়ে দিতেন। কুরআনের এ আয়াত পড়ে তাঁদেরকে ইবাদাতের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

‘তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার ওপর অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দিই। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য।’[১৫]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগে নিজে, দ্বিতীয় ভাগে তাঁর স্ত্রী এবং তৃতীয় ভাগে তাঁর খাদেম তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। একজন ঘুমুতে যাওয়ার আগে পরবর্তী জনকে জাগিয়ে দিতেন।[১৬]

---

[১৪] সহীহ বুখারি, অধ্যায় : চাশতের সালাত

[১৫] সূরা তহা : ১৩২

[১৬] সহীহ বুখারি, অধ্যায় : খাবার